বাংলার ইতিহাসঃ নবাবি আমল (১৭০৭-১৭৫৭ খ্রিঃ)

ইউনিট ৭

ভূমিকাঃ

বাংলার ইতিহাসের পট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নবাবি আমলের গুরুত্ব সর্বাধিক। মুর্শিকুলি খানের শাসন কাঠামোয় আবির্ভাব থেকে শুরু করে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে বদল এসেছিল তারই ধারাবাহিক পরিণতি হিসেবে ব্রিটিশরা ক্ষমতা দখল করেছিল বাংলার। অনেক দরিদ্র পরিবারের সন্তান মুর্শিদকুলি খান প্রথমে সাধারণ একজন দিউয়ান হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। নানা স্থানে দিউয়ানীর কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্রাট আওরঙ্গজেবকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল। আওরঙ্গজেব তাঁকে হায়দারাবাদের দিওয়ান নিযুক্ত করার পর তাঁকে "করতলব খান" উপাধিও প্রদান করা হয়। অভিজ্ঞতা ও কর্ম নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও রাজস্ব সংস্কারের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। বলতে গেলে তার মাধ্যমেই বাংলায় নবাবি শাসনের উত্থান হয়েছিল। তারপর পরবর্তীকালের শাসকদের অদূরদর্শীতা, অদক্ষতা ও বিশৃঙ্খল আচরণ শেষ পর্যন্ত নবাবি শাসনের পতন ডেকে আনে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহঃ

পাঠ- ১ : মুর্শিদ কুলি খান: নাববি শাসন প্রতিষ্ঠা

পাঠ- ২ : মুর্শিদ কুলি খান: চরিত্র ও কৃতিত্ব

পাঠ- ৩ : সুজাউদ্দিন খান ও সরফরাজ খান: চরিত্র ও কৃতিত্ব

পাঠ- ৪ : আলিবর্দী খান

পাঠ- ৫ : নবাব সিরাজউদ্দৌলা

পাঠ- ৬ : পলাশীর যুদ্ধ: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল

পাঠ- ৭ : নবাবি শাসনের পতন

পাঠ- ৮ : নবাবি বাংলার আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

পাঠ-৭.১ মুর্শিদ কুলি খানঃ নবাবি শাসন প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুর্শিদ কুলি খানের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তিনি কিভাবে শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন সে সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- তার সময়ে প্রশাসনিক সংস্কার কতটা জরুরী হয়েছিল তা বুঝতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**মুর্শিদকুলি খান, করতলব খান ও মুর্শিদাবাদ**

ভূমিকাঃ মুর্শিদকুলি খান দক্ষিণ ভারতের একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি। হাজী শফী ইস্পাহানী ছিলেন দাক্ষিণাত্যে শায়েস্তা খানের দিওয়ান। তিনি অল্প বয়সী মুর্শিদ কুলিকে কিনে নিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। প্রথমে তার নাম রাখা হয় মুহাম্মদ হাদী। ১৬৯৬ সালের দিকে হাজী শফীর মৃত্যু হলে তিনি বেরার প্রদেশে চলে যান। সেখানে দেওয়ান হাজি আব্দুল্লাহ খোরাসানীর অধীনে চাকরি নিয়েছিলেন।

অবস্থার পরিবর্তন

রাজস্ব আদায়ের কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত সম্রাট আওরঙ্গজেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কর্মদক্ষতার গুণে আপ্লুত আওরঙ্গজেব তাঁকে হায়দারাবাদের দিওয়ান নিযুক্ত করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে "করতলব খান" উপাধি প্রদান করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও কর্ম নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে আওরঙ্গজেব বাংলার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও রাজস্ব সংস্কারের দায়িত্ব প্রদান করেন। পাশাপাশি মুকসুদাবাদের ফৌজদারের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর উপরেই।

পটভূমি

নবাব মুর্শিদ কুলি খান

সম্রাট আকবরের সময় থেকে প্রত্যেক সুবায় সুবাদার ও দিউয়ান নামে দুটি পদে স্বতন্ত্র কর্মচারি নিয়োগ শুরু হয়েছিল। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দক্ষ কূটনৈতিক হিসেবে একটু ভিন্ন চিন্তা করেছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। তিনি এই দুটি পদ অক্ষুন্ন রাখলেও পদ দুটির কর্মকাণ্ড সীমিত করে দিয়েছিলেন। এর মধ্য দিয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কারো এককভাবে শক্তিশারী হয়ে ওঠার সুযোগ কমে এসেছিল। এই দুই পদে অধিষ্ঠিত দুজন কর্মকর্তার ক্ষমতায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৭০০ সালে মুহাম্মদ হাদিকে সম্মানসূচক 'করতলব খান' উপাধি দিয়ে দিউয়ান হিসেবে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। নতুন দায়িত্ব পেয়ে নিজস্ব সৈন্যের বহর নিয়ে ঢাকায় আসেন তিনি। রাজস্ব ও অর্থনৈতিক প্রশাসনে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সম্রাটের আস্থা অর্জনে সময় লাগেনি তাঁর। তিনি ছিলেন সৎ এবং সম্রাটের অত্যন্ত বিশ্বস্ত। কিন্তু রাজকীয় স্বার্থ রক্ষা করতে বাংলার নাজিম ও সম্রাটের দৌহিত্র আজিম-উস-শান এর সঙ্গে তাঁর বিবাদ বেধেছিল। ফলে এক পর্যায়ে করতলব খানের জীবন হুমকির মুখে পড়েছিল। এরই সূত্র ধরে সম্রাটের হস্তক্ষেপে করতলব খানের প্রতি সুবিচার করা হয়। ১৭০২ সালে সম্রাট তাঁকে গঙ্গার তীরবর্তী (ভাগীরথী শাখা) মকসুদাবাদে দফতর স্থানান্তরের অনুমতি দেয়া হয় ।

উপাধি লাভ

কলতলব খানের সঙ্গে বিরোধের কারণে সম্রাট আওরঙ্গজেব আজিম উস শানকে পাটনায় প্রেরণ করেন। তিনি তাকে নায়েবের মাধ্যমে প্রদেশ শাসনের আদেশ দিয়েছিলেন। করতলব খানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্যের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায় তখন। এরপর ১৭০৩ সালে তিনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দাক্ষিণাত্য গিয়েছিলেন। নবাবের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর

তিনি 'মুর্শিদকুলী খান' উপাধি লাভ করেন। তাঁর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট তাঁকে উড়িষ্যার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানিও লাভ করেছিলেন তিনি। এদিকে প্রায় ৫টি জেলার ফৌজদার পদের দায়িত্বও অর্পিত হয় তার উপর। এরপর সম্রাট তাকে "মুর্শিদ কুলি খান" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। পরে তাঁর নামানুসারে মুকসুদাবাদের নাম পরিবর্তন করে 'মুর্শিদাবাদ' রাখার অনুমতি মেলে। ১৭০৪ সালের দিকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি রাজকীয় টাকশাল। প্রায় ১৩ বছর পর ১৭১৭ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে বাংলার পূর্ণ সুবাদারের মর্যাদা দেয়া হয়।

শাসন ক্ষমতা লাভ

১৭০৭ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। এরপর পুরো মুঘল সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। এ সময় থেকে অনুপস্থিত নাজিমের পক্ষে তিনিই বাংলার নায়েব এ নাজিম হিসেবে শাসন করতে থাকেন। এরপর বাহাদুর শাহের সময় মুর্শিদ কুলি খানকে দাক্ষিণাত্যে বদলি করা হয়। তবে বাংলার নতুন করে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাকে মাত্র দুই বছরের মধ্যে এখানে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। ১৭১০ সালে বাংলায় ফিরে আসার পর তিনি নতুনভাবে শক্তিমত্তা প্রদর্শন শুরু করেন। এখানকার শাসক হিসেবে তিনি নানা ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেন। একটা পর্যায়ে পুরো সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তার সমাধান করেছিলেন মুর্শিদ কুলি খান। তাঁর এই সাফল্য শেষ পর্যন্ত ১৭১৬ সালের দিকে তার বাংলার নাজিম পদে উন্নীত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তিনি অসংখ্য উপাধি ও পদবিতে ভূষিত হন। প্রথমে তাঁকে 'জাফর খান' উপাধি দেয়া হয়েছিল পরে তাঁকে 'মুতামিন-উল-মুলক আলা-উদ-দৌলা জাফর খান নাসিরী নাসির জঙ্গ বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করতে দেখা যায়। এর পাশাপাশি তাঁকে সাত হাজারি মনসব প্রদান করা হয়েছিল। ১৭১৭ সালে প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়ে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট দ্রুত সময়ের মধ্যে উড়িষ্যার সুবাদার নিয়োগ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানিও লাভ করেছিলেন তিনি। এদিকে প্রায় ৫টি জেলার ফৌজদার পদের দায়িত্বও অর্পিত হয় তার উপর। এরপর সম্রাট তাকে মুর্শিদ কুলি খান উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। পরে তাঁর নামানুসারে মুকসুদাবাদের নাম পরিবর্তন করে মুর্শিদাবাদ রাখার অনুমতি দেন। ১৭০৪ সালের দিকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি রাজকীয় টাকশাল। এর প্রায় ১৩ বছর পর ১৭১৭ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে বাংলার পূর্ণ সুবাদারের মর্যাদা দেয়া হয়। তিনি মুর্শিদাবাদকে বাংলার রাজধানীতে পরিণত করেছিলেন। ১৭২৭ সালে মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ারের মৃত্যু অবধি এই পদে বহাল ছিলেন তিনি।

শিক্ষার্থীর কাজ	**মুর্শিদ কুলি খানের শাসন ক্ষমতা লাভের উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।**

সারসংক্ষেপঃ

নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতায় দক্ষিণ ভারতের একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও শেষ পর্যন্ত নবাব পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন মুর্শিদ কুলি খান। কর্মদক্ষতার গুণে আপ্লুত আওরঙ্গজেব তাঁকে হায়দারাবাদের দিউয়ান নিযুক্ত করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে "করতলব খান" উপাধি প্রদান করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও কর্ম নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে আওরঙ্গজেব তাকে বাংলার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও রাজস্ব সংস্কারের দায়িত্ব প্রদান করেন ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. কোন মুঘল সম্রাট মুর্শিদ কুলি খানকে 'মুর্শিদ কুলি' উপাধি দেন।
ক) সম্রাট শাহজাহান খ) সম্রাট আওরঙ্গজেব গ) সম্রাট ফররুখশিয়ার ঘ) সম্রাট শাহ আলম

২. 'করতলব খান' উপাধি ছিল—
ক) মুর্শিদকুলি খানের খ) সরফরাজ খানের গ) শুজাউদ্দিন খানের ঘ) আলীবর্দী খানের

৩. মুর্শিদ কুলি খানের ক্ষমতা গ্রহণের সময় আয়ের একমাত্র উৎস ছিল—
ক) ভূমি রাজস্ব খ) বাণিজ্য শুল্ক গ) কৃষি কর ঘ) আবগারী শুল্ক

৪. মুর্শিদ কুলি প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থার নাম ছিল
ক) 'মাল জামিনি' খ) নানকর গ) পথ কর ঘ) ভূমিকর

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জামান তার মামার কাছে শুনেছে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ছিলেন মুর্শিদকুলি খানের বংশধর। এটা ভুল না সঠিক সে ঠিকমত মনে করতে পারছে না। তার খুব জানতে ইচ্ছে করে মুর্শিদকুলি খান কিভাবে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। এজন্য সে লাইব্রেরিতে গিয়ে নবাবি বাংলার ইতিহাসের উপর একটি বই উল্টেপাল্টে দেখতে থাকে। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিন–

১. মুর্শিদ কুলি খান কে ছিলেন? ১
২. কর্মময় জীবনে কি কি পদক্ষেপ মুর্শিদ কুলি খানকে অমর করেছে? ২
৩. উদ্দীপকের মুর্শিদ কুলি খান কিভাবে তার ক্ষমতা সংহত করেন। ৩
৪. মুর্শিদ কুলি খান যে উপাধি প্রাপ্ত হন তার সক্ষমতা কতটুকু ছিল-ব্যাখ্য করুণ? ৪

পাঠ-৭.২ মুর্শিদ কুলি খানঃ চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুর্শিদ কুলি খানের কর্মময় জীবনের নানা দিক জানতে পারবেন;
- নবাবি আমলের রাজস্ব সংস্কার সম্পর্কে জানবেন ও
- মুর্শিদ কুলি খানের রাজস্ব সংস্কারের প্রভাব কি ছিল তা আলোচনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ	**বাণিজ্য শুল্ক, খাজনা ও ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি**

মুর্শিদ কুলি খান যখন বাংলার শাসক হয়ে আসেন তখন এখানকার রাজস্ব ব্যবস্থা সঠিক ছিলনা। শের শাহের মত তিনিও বাংলার প্রায় পুরো জমি পরিমাপের চেষ্টা করেন। এরপর কর্মচারিদের বেতনের পরিবর্তে জায়গীর হিসেবে নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলোর আয় হিসেব করেছিলেন। তখন ভূমি রাজস্ব থেকে সরকারের তেমন আয় হত না। রাজকোষের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল বাণিজ্য শুল্ক। এর বাইরে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণে নিয়মিত ভূমি জরিপও প্রচলিত হয়নি তখন। জমিদাররা সরকারকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়েই নিজের দায় শেষ করতেন।

অনেক ক্ষেত্রে তারা সুযোগ বুঝে প্রজাদের নিকট থেকে নিজেদের নির্ধারিত হারের বেশি খাজনা আদায় করতেন। এক্ষেত্রে প্রজারা নানা দিক থেকে নির্যাতিত হতেন। এদিকে তারা জনগণের থেকে অতিরিক্ত আয় করলেও তার থেকে বিন্দুমাত্র গিয়ে রাজকোষে জমা হওয়ার সুযোগ ছিল না। নতুনভাবে ক্ষমতা দখলের পর মুর্শিদ কুলি খান এই পদ্ধতি সংস্কারের চেষ্টা করেন। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য মুর্শিদকুলি খান প্রথমে নানাবিধ সংস্কার নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রধানত দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমত, তিনি মুঘল কর্মচারীদের প্রায় প্রতিটি জায়গীরকে খাসজমিতে পরিণত করা এবং এর পরিবর্তে কর্মচারীদেরকে উড়িষ্যার অনুন্নত অঞ্চলে জায়গীর বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব জমিদারদের থেকে ইজারাদারদের উপর বর্তায়। তারা বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে এই দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেতেন। এই সংস্কার প্রস্তাবের উপযুক্ত বাস্তবায়ন করতে পারায় নানা দিক থেকে বাংলা সরকারের আয় বেড়ে গিয়েছিল। মুর্শিদ কুলি খানের সংস্কারের আগে বাংলার জমিদারগণ বার্ষিক নির্দিষ্ট হারে সম্রাটকে রাজস্ব দিতেন। এতে বেশিরভাগ জমিদার অলস হয়ে পড়েন, রাষ্ট্রও অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছিল। শকার হন। জমিদারগণ সময়মত নির্দিষ্ট পরিমাণের রাজস্ব প্রদান করতে পারছিলেন না। ফলে মুর্শিদকুলি খান অনেকটা বাধ্য হয়ে জমিদারদের বদলে ইজারাদারদেরকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই রাজস্ব ব্যবস্থা 'মাল জামিনি' নামে পরিচিত ছিল। মুর্শিদকুলি খান বেছে বেছে এমন লোকদের এই ইজারাদার পদে নিয়োগ করেছিলেন যাদের কাছ থেকে পাওনা আদায় তার পক্ষে সহজ ছিল। অন্যদিকে রাজস্ব কর্তৃত্বের প্রতি অধিকতর অনুগত একটি শ্রেণিকে এক্ষেত্রে দায়িত্ব দিতে দেখা যায়।

রাজস্ব সংস্কারের ফলে মুর্শিদ কুলি খান নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত অর্থ দাবী করা থেকে ইজারাদারদের প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন। এতে মুঘল কর্মচাররিগণ কোনরূপ অতিরিক্ত কর আদায় করতে পারত না। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করলেও গৃহীত নিয়ম বাস্তবায়নে তেমন বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। এদিকে ইজারাদারগণ নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হলে বা কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করলে মুর্শিদ কুলি খান তাদের প্রতি বিরূপ আচরণ করতেন। ব্যর্থ হওয়া ইজারাদারদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিনি অনেক ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থাও নিয়েছেন। এর আগে জমিদারদের থেকে যে রাজস্ব আদায় করা হত তা এক অর্থে নিশ্চিত ছিল না। সংস্কারের পর প্রচলিত এ নতুন নিয়ম সরকারি আয় সুনিশ্চিত করেছিল। মুর্শিদকুলি খান বাংলার সকল আবাদী ও অনাবাদী জমি জরিপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তি বিশেষে হিসেব না করে জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে রাজস্ব ধার্য করেন। এক একটি জমির বিবরণের লিপিবদ্ধকরণের পাশাপাশি কৃষকদের নাম ঠিকানাও লিখে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তখন। পাশাপাশি কৃষকরা কি পরিমাণ কর দিয়েছে সেটাও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন। রাজস্ব সংগ্রহের ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্যে তিনি পুরো বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেছিলেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি চাকলার দায়িত্বে ছিলেন একজন পেশাদার ব্যক্তি তিনি আমীন নামে

পরিচিত ছিলেন। মুর্শিদ কুলি খানের রাজস্ব সংস্কার অনেক জমিদারকে বিপদে ফেলে। তাদের জমিদারি উচ্ছেদের পর তারা যাতে বিপদে না পড়ে সেজন্য সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুর্শিদ কুলি খান। তিনি নানা স্থান থেকে উচ্ছেদকৃত জমিদারদের ভরণ পোষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হিসেবে তখন "নানকর" প্রচলন করা হয়। এর পাশাপাশি জমিদারদের মধ্যে যারা রাজস্ব ব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায়ের চুক্তি গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন তাঁদেরকে ইজারাদার পদে নিয়োগ করা হয়। ফলে নিজের ভূমির উপর থেকে অধিকার হারানো জমিরদারগণ বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। রাজস্ব বৃদ্ধির নানা উপায় বের করার পাশাপাশি মুর্শিদকুলি খান ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করেন। তিনি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বেশ কমিয়ে এনেছিলেন। এর বাইরে শাসন বিভাগের বহুবিধ ব্যয় সংকোচ করে তিনি রাজকোষের আয় বৃদ্ধি করেছিলেন। অন্তত রাজস্ব সংস্কারের পাশাপাশি তার এই ব্যয় সংকোচন নীতিই নবাবি বাংলার কোষাগার সমৃদ্ধ করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

মুর্শিদ কুলি খান ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাংলার বাণিজ্য সমৃদ্ধির পাশাপাশি রাজকোষাগার ফুলে ফেঁপে ওঠার কৃতিত্ব অনেকটাই তাঁর উপরে বর্তায়। তিনি আর্থিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ইউরোপীয় ও স্থানীয় বণিকদের প্রায় প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। পাশাপাশি বণিকদের নির্বিঘ্ন ও অবাধ পণ্য চলাচল নিশ্চিত করতে তার পদক্ষেপ ছিল প্রশংসার দাবিদার। অন্তত বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে বণিকদের নিকট থেকে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় তিনি পছন্দ করতেন না। তবে তিনি ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য ইংলিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট থেকে প্রচলিত স্বল্প হারে শুল্ক আদায়ের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা একটা পর্যায়ে সর্বনাশের কারণ হয়েছিল। মুর্শিদ কুলি খানের নানাবিধ সংস্কারে যেমন জনজীবনে স্বস্তি মিলেছিল, তেমনি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির নানামুখী প্রচেষ্টার ফলে (১) রাজস্ব খাত থেকে প্রাপ্ত আয় সুনির্দিষ্টকরণ সম্ভব হয়। (২) সরকারের আয় পূর্বের তুলনায় বেশ বেড়ে যায়। (৩) রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্মচারীদের দাপট ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন বাংলার কৃষকগণ। (৪) বাণিজ্য শুল্ক নির্দিষ্ট হওয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি লক্ষ্য করা যায় । (৫) রাজস্ব আয় বেড়ে যাওয়ার মাধ্যমে সরকার কৃষি ঋণ দিতে শুরু করে।

নবাব মুর্শিদ কুলি খানের সমাধি

বিশেষত, তাঁর রাজস্ব সংস্কার দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক অগ্রগতি নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে তাঁর "মাল জামিনি" রাজস্ব ব্যবস্থায় ইজারাদার নির্বাচনে হিন্দুদের প্রাধান্য দেওয়ায় একটি নতুন অভিজাত শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল। এরাই পরবর্তীকালে লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় বংশানুক্রমে জমিদারী ভোগের অধিকার লাভ করেছিল। অন্যদিকে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য মুর্শিদ কুলি খান এমন কিছু নীতি গ্রহণ করেছিলেন যা শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের কারণ হয়। অন্তত বাংলা থেকে শুরু করে পুরো ভারতবর্ষে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিস্তার লাভের দায় অনেকাংশে মুর্শিদ কুলি খানের উপর বর্তায়। পরবর্তীকালে মুর্শিদ কুলী খানের প্রবর্তিত রাজস্ব পদ্ধতি বহুলাংশে অনুসরণ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। কেন্দ্রিয় মুঘল শাসনের দুর্বলতার সময় নিয়মিত রাজস্ব পাঠানোর কারণে মুর্শিদ কুলি খানকে বংশানুক্রমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ করা হয়। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান মৃত্যু বরণ করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	**মুর্শিদ কুলি খানের প্রশাসনিক সংস্কারের উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।**

সারসংক্ষেপঃ

আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সময়কালকে নবাবি বাংলার উত্থানপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তখনকার মুঘল সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। বাংলার ইতিহাসে এই শাসকরাই নবাব বলে পরিচিতি পান। সুবাদার মুর্শিদকুলি খান নবাব হিসেবে প্রশাসনিক অনেকগুলো সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি রাজস্ব সংস্কারের পাশাপাশি আরও অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মুর্শিদ কুলি খানের ক্ষমতা গ্রহণের সময় আয়ের একমাত্র উৎস ছিল—
ক) ভূমি রাজস্ব খ) বাণিজ্য শুল্ক গ) কৃষি কর ঘ) আবগারী শুল্ক

২. মুর্শিদ কুলি প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থার নাম ছিল
ক) 'মাল জামিনি' খ) নানকর গ) পথ কর ঘ) ভূমিকর

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

বিকেলের খেলাধুলা শেষ করে বাসায় ফিরে পড়তে বসেছে মামুন। পাশের রুমে উচ্চ শব্দে টিভি দেখায় সে খুব বিরক্ত হয়। ভলিউম কমানোর জন্য পাশের রুমে যেতে সে খেয়াল করে সবাই খুব মন দিয়ে সুলতান সুলাইমানের ডাবকৃত বাংলা সিরিয়াল দেখছে। টিভি স্ক্রিনে চোখ রাখতে তার হঠাৎ মনে পড়ে নবাব সিরাজ সিরাজুদ্দৌলার কথা। সে কোথায় যেন পড়েছিল নবাব সিরাজুদ্দেদৌলা ছিলেন মুর্শিদকুলি খানের বংশধর। এটা ভুল না সঠিক সে ঠিকমত মনে করতে পারছে না। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিন–

১. 'মালজামিনি' ব্যবস্থা কি? ১
২. বাণিজ্য সংস্কারের ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ মুর্শিদ কুলি খানকে অমর করেছে? ২
৩. মুর্শিদ কুলি খান রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কি কি সংস্কার করেছিলেন-বিবরণ লিখুন? ৩
৪. মুর্শিদ কুলি খানের নানাবিধ সংস্কারের ফলাফল কি ছিল বিশ্লেষণ করুণ? ৪

পাঠ-৭.৩ সুজাউদ্দিন খান ও সরফরাজ খান: চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসক হিসেবে সুজাউদ্দিন খানের অর্জন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সুজাউদ্দিন খানের ছেলে সরফরাজ খানের রাজত্বকালের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ	**রওশনাবাদ, সিরার উল মুতাখখিরিন ও জিনাত-উন-নিসা**

সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭ খ্রি.– ১৭৩৯ খ্রি.): দক্ষ প্রশাসক হলেও নবাব মুর্শিদকুলি খানের কোন পুত্র ছিলনা। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর জামাতা সুজাউদ্দিন খান উত্তররাধিকারী নির্বাচিত হন। একজন নবাব হিসেবে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাবি তার উপর বর্তায়। তুর্কি বংশোদ্ভুত সুজাউদ্দিনের পিতা ছিলেন বুরহানপুরে মুঘল সরকারের একজন কর্মচারি। তিনি সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সকলের আস্থা অর্জন করেছিলেন। পাশাপাশি নবাব মুর্শিদ কুলির সাথেও তার পরিচয় এখানে। পরবর্তীকালে মুর্শিদ কুলি খানের মেয়ে জিনাত-উন-নিসার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সুজাউদ্দিনের। তাঁর পুত্র সরফরাজ খান এবং মেয়ে নাফিসা বেগম। তবে মুর্শিদকুলি যখন বাংলার দিওয়ান এবং উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন তখনই তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিনকে উড়িষ্যার নায়েবে নাজিম নিযুক্ত করেছিলেন।

তবে মুর্শিদ কুলি খান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তার জামাতা সুজাউদ্দিনের চেয়ে তাঁর নাতি সরফরাজ খান অধিক যোগ্য। তিনি চেয়েছিলেন ফররুখ শিয়ারের অনুমতি প্রাপ্তি সম্ভব হলে সরফরাজকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে। উচ্চাভিলাষী সুজাউদ্দিন বিপদ বুঝতে পেরে সসৈন্যে মুর্শিদ কুলির বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। ১৭২৭ সালে মুর্শিদ কুলির মৃত্যুর পর তিনি মুর্শিদাবাদে গিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। পাশাপাশি মুঘল সম্রাটের নিকট থেকে ফরমানও লাভ করেন তিনি। এরপর তিনি নবাব হিসেবে বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন। পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতে দেখে তার ছেলে সরফরাজ খানও তার বাবার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন এ পর্যায়ে। ফলে সুজাউদ্দিন খান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এ তিন প্রদেশেরই নবাব হয়েছিলেন। মুর্শিদ কুলি খানের জীবদ্দশায় শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করতে গিয়ে প্রথমেই নানামুখী সংকটের মুখে পড়েছিলেন সুজাউদ্দিন খান। তবে দায়িত্ব গ্রহণের থেকে সুজাউদ্দিন শক্ত হাতে শাসন পরিচালনা করেন। তিনি বিদ্রোহ দমন করতে নানা ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও আস্থা-ভাজনদের উচ্চ পদ দান করায় তার কাজ বেশ সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে তার ছেলে সরফরাজ খান লাভ করেন বাংলার দিওয়ানি। একইসঙ্গে জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি বাংলার নায়েব-নাজিম হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। অন্যদিকে তারই সিদ্ধান্তে মির্জা হাবিবুল্লাহ সিরাজী সেনাপতি পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা কাউন্সিলও গঠন করেছিলেন তিনি। তাঁর গঠিত উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন আলীবর্দী খান, হাজি আহমদ, জগৎশেঠ, আলম চাঁদ প্রমূখ।

সুজাউদ্দিন খান ক্ষমতা দখল করতে গিয়ে কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পাশাপাশি তাঁর অনেক উচ্চভিলাসী সিদ্ধান্ত সমস্যার জন্ম দেয়। হাবিবুল্লাহ সিরাজী, আগা সাদেক ও বরকত খানকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরা অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সুজাউদ্দিনের সেনাদল ত্রিপুরার চণ্ডীগড় দুর্গ আক্রমণ করলে সেখানকার রাজা ভয় পেয়ে বনাঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন সেখানে আত্মগোপন করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি এই পলাতক রাজার ভাইপো ত্রিপুরা রাজ্যের অধিপতি হন। তবে পুরো অঞ্চলের উপর আধিপত্য নিশ্চিতকল্পে আগা সাদেককে সেখানকার ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। সুজাউদ্দিনের নির্দেশে ত্রিপুরার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'রওশনাবাদ'। বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন সুজাউদ্দিন খান। নানা স্থানে উপযুক্ত স্থাপনা ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাঁর গৃহীত উদ্যোগ নানা স্থানে সমৃদ্ধির কথা জানান দেয়। এক্ষেত্রে নানা স্থানে বিদ্রোহ দমনের কৃতিত্ব তাঁরই। বিশেষ করে দিনাজপুরের জমিদার, কুচবিহারের রাজা এবং বীরভূমের জমিদার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাঁর সময়ে। এরা প্রত্যেকেই নিয়মিত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করে কঠোরভাবে দমন করেছিলেন তাদের। প্রশাসনিক সংস্কার, বিদ্রোহ দমন থেকে শুরু করে নানা স্থানে শাসক হিসেবে সুজাউদ্দিনের সুখ্যাতি ছিল। তিনি বিদ্যমান নানা প্রথার সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রশাসনে নতুন গতি সঞ্চার করেছিলেন। রাজস্ব ব্যবস্থা তিনি পুরোপুরি নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পাশাপাশি রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উপযুক্ত রাখে তার প্রশাসন। অনেক ইতিহাসবিদ দাবি করেছেন তিনি উদার ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর শাসনামলকে নবাবি বাংলার 'শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ'

বলে আখ্যায়িত করেছেন অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক। তিনি শায়েস্তা খানের সময় বন্ধ করে দেওয়া তোরণদ্বার উন্মোচন করেন। তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ এবং তাঁর সুবার বিভিন্ন স্থানে বহু সুরম্য প্রাসাদ, দালান-কোঠা, মসজিদ, উদ্যান জলাশয় প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। সুজাউদ্দিন ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করলে শাসক হিসেবে ক্ষমতায় আরোহণ করেন তার ছেলে সরফরাজ খান।

সরফরাজ খান (১৭৩৯ খ্রিঃ —১৭৪০খ্রিঃ)

নবাবি বাংলার শাসক হিসেবে নিজের নামের প্রতি সেভাবে সুবিচার করতে পারেননি সরফরাজ খান। তিনি তার পিতা সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবি লাভ করেছিলেন। ইতিহাসবিদদের অনেকে তাকে অকর্মা, অনভিজ্ঞ, আমোদপ্রিয় এবং চরিত্রহীন বলে চিহ্নিত করেছেন। তার সময় থেকেই নবাবি বাংলার শাসন কাঠামোতে ধ্বস নেমিছিল। তিনি শাসনকাজে অবহেলা প্রদর্শন করে হেরেমের আমোদ-প্রমোদে ডুবে থাকতেন বেশিরভাগ সময়। অন্যদিকে সেনাবাহিনী শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হওয়ায় তার সময় পুরো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছিল। তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা ও প্রশাসনিক অক্ষমতা তাঁর দুর্দিন ডেকে আনে। তার ভাগ্যবিপর্যয়ের সুযোগে বিহারের উচ্চাভিলাষী নায়েব-নাজিম আলীবর্দী খান সুযোগ নিয়েছিলেন। তিনি শক্তিশালী সেনাদল গঠন করে তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে ১০ এপ্রিল গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খান পরাজিত ও নিহত হন। এরপর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবি লাভ করেন আলীবর্দী খান। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান রচিত 'সিরার উল মুতাখখিরিন' গ্রন্থে সরফরাজের এই অধঃপতনের নানা কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**সুজাউদ্দিন খানের শাসনকালের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।**

সারসংক্ষেপঃ

মুর্শিদকুলি খান বাংলায় নবাবি শাসন শুরু করেছিলেন। তার কোন ছেলে না থাকায় তিনি তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চেয়েছিনেন। কিন্তু সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দিন জোর খাটিয়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হয়েছিলেন। সুজাউদ্দিনের শাসনকালে বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিল। তবে অযোগ্য পুত্র সরফরাজ খান তার এই ধারা ধরে রাখতে পারেননি। তাকে পরাজিত করে আলিবর্দী খান বাংলার সিংহাসন দখল করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সুজাউদ্দিন খান ক্ষমতা দখল করেন —
   ক) ১৭২৭ সালে খ) ১৭১৭ সালে গ) ১৭৪৭ সালে ঘ) ১৭৩৭ সালে

২. কোন নবাবের সময়কালকে শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ বলা হত
   ক) সুজাউদ্দিন খান খ) চেঙ্গিস খান গ) কুবলাই খান ঘ) সরফরাজ খান

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

বিকেলে কলেজ থেকে বাসায় ফেরে রাকিব। ড্রইং রুমে ঢুকতেই সে দেখে তার বাবা খুব মন দিয়ে দৈনিক পত্রিকা পড়ছেন। মার্কিন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের পর প্রত্যেকটি দৈনিক পত্রিকা নেতিবাচক শিরোনামসহ সংবাদ ছেপেছে। তার মনে পড়ে সুজাউদ্দিনের পর তার ছেলের কি কি ভুলের কারণে বাংলার নবাবি শাসনে একটা বড় রকম পরিবর্তন এসেছিল।

উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিন–

১. সুজাউদ্দিন খান খান কে ছিলেন? ১
২. কর্মময় জীবনে কি কি পদক্ষেপ সুজাউদ্দিন খানকে অমর করেছে? ২
৩. সরফরাজ খান কিভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। ৩
৪. বাংলার নবাব হিসেবে আলিবর্দী খানের উত্থানকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? ৪

পাঠ-৭.৪ আলিবর্দী খান (১৭৪০-৫৬ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নবাব হিসেবে আলিবর্দী খানের বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসন লাভের বিবরণ দিতে পারবেন;
- বাংলায় ইউরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তারে আলিবর্দী খানের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- পরিচয়সহ তাঁর কর্মময় জীবনের বিবরণ দিতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**মারাঠা, গিরিয়ার যুদ্ধ, বর্গী ও ভাস্কর পণ্ডিত**

ভূমিকা: ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে গিরিয়ার যুদ্ধে বাংলার দুর্বল নবাব সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন আলীবর্দী খান। আলীবর্দীর রাজত্বকাল ছিল বাংলার ইতিহাসের অন্যতম সমৃদ্ধ সময়। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি নানামুখী অর্জন এই সময়কালকে ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে। সাহসী নেতৃত্ব ও সুযোগ্য শাসনের মাধ্যমে তিনি বাংলাকে মারাঠাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। যোগ্যতা ও দক্ষতাগুণে তিনি একেবারে সহায় সম্বলহীন অবস্থা থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে আসীন হয়েছিলেন তিনি। বিদেশী আক্রমণ থেকে শুরু করে স্থানীয় নানা অরাজকতার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করতে হয়েছিল তাঁকে। তার পরেও প্রায় ১৬ বছর নবাবি অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় প্রথম মারাঠা আক্রমণ শুরু হয়। মারাঠা নায়ক ও মারাঠাদের অন্যতম সেনাপতি রঘুজী ভোঁশলে তার প্রধান মন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিতকে বাংলা অভিযানে পাঠান। তার সাথে ৪০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত তার হিংস্র বর্গী বাহিনী নিয়ে বাংলায় প্রবেশ করে। তারা বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের নানা স্থানে লুঠতরাজ শুরু করে। তাদের প্রতিরোধে আলীবর্দী খান হুগলি থেকে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। আলীবর্দী খানের শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর উপযুক্ত তৎপরতায় ভাস্কর পণ্ডিত যুদ্ধে পেরে ওঠেননি। পরাজিত ভাস্কর পণ্ডিত ১০ লাখ টাকার বিনিময়ে স্বদেশে ফিরে যেতে রাজী হন। তবে এর পরে বর্গী বাহিনী নবাবের কাছে ১ কোটি টাকা দাবী করে। পরিস্থিতি ভয়াবহ দিকে মোড় নেয় দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানের সেনাপতি মীর হাবীব ভাস্কর পণ্ডিতের সাথে যোগদান করলে। এতে তাদের শক্তি বৃদ্ধির পর তারা বেপরোয়াভাবে মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ সহ নানা স্থানে লুঠতরাজ শুরু করে।

আলীবর্দী খান কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেও তাদের দমনে ব্যর্থ হন। অনন্যোপায় হয়ে নবাব শঠতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি ভাস্কর পণ্ডিতের ২২ জন বিশ্বস্ত অনুচরসহ তাকে হত্যা করেন। এর পরেও মারাঠা আক্রমণ থেকে বাংলা মুক্তি পায়নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে নবাব তাদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। এরপর চুক্তির শর্ত হিসেবে ঠিক করা হয়–

১. মীর হাবীব আলীবর্দী খানের অধীনের উড়িষ্যার নায়েব নাযিম থাকবেন।
২. এ প্রদেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব মারাঠা সৈন্যদের ব্যয়ভার বহন বাবদ রঘুজী ভোঁশলে পাবেন।
৩. চৌথ বাবদ বাংলার রাজস্ব থেকে ১২ লক্ষ টাকা রঘুজীকে দিতে হবে।
৪. মারাঠা সৈন্যরা সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে বাংলায় প্রবেশ করতে পারবে না।

এ-চুক্তির পর মারাঠারা আর বাংলায় হানা দেয় নি। বাংলায় বার বার মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই চুক্তি এক অর্থে বাংলার মানুষকে রক্ষা করে। এরপর ১৭৪৮ সালের দিকে বিদ্রোহী আফগানরা নবাবের বড় ভাই হাজী আহমদ ও তাঁর পুত্র জৈনুদ্দিনকে হত্যা করে। তারা তাঁর স্ত্রী আমেনা বেগম ও তার সন্তানদের বন্দী করে। এ মর্মান্তিক সংবাদ পেয়ে নবাব বিদ্রোহী আফগান শক্তিকে ধ্বংস করে বিহার পুনরুদ্ধার করেন। পাশাপাশি আমেনা বেগম ও তাঁর সন্তানদেরও মুক্ত করেন তিনি। এ ঘটনার পর তিনি তার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বিহারের নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেন।

উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমনের পরও রাজ্যজুড়ে শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি আলীবর্দী খান। এর প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হয় মারাঠা আক্রমণকে। এ সময় শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্থান এই উপমহাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। জাতীয়তা ও হিন্দুধর্মীয় চেতনায় সংঘবদ্ধ হয় মারাঠারা। জাতি হিসেবে সাহসী, কঠোর পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল তারা। মারাঠারা দীর্ঘ ১০ বছর (১৭৪১ খ্রিঃ - ১৭৫১ খ্রিঃ) বারবার বাংলায় আক্রমণ চালিয়ে আলীবর্দী খানকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। মারাঠাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন, নারী নির্যাতন, শিশু অপহরণ ও হিংস্রতার ফলে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। বাংলায় দস্যু বৃত্তিতে লিপ্ত এ মারাঠীরা বর্গী নামে পরিচিত হয়। তাদের আক্রমণে নানা স্থানে শহর-বাজার জনমানবহীন হয়ে পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে পড়ে। অনেক এলাকা থেকে কৃষকরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। কৃষি জমি অনাবাদী পড়ে থাকায় বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে কৃষিকাজ। আলীবর্দী খান দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনে আলীবর্দী খান ইউরোপীয় বণিকদেরকে বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। প্রথম দিকে তিনি তাদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হলেও পরে চরমভাবে ব্যর্থ হন। ফফে এক পর্যায়ে স্থানীয় বণিকদের স্বার্থ রক্ষা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত সচেতন ইংরেজরা নানা স্থানে শক্তিশালী বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। সেখানে তারা বাণিজ্যের পাশাপাশি নানামুখী সামরিক স্থাপনা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

নবাব সুজাউদ্দিন ১৭৩৩ সালের দিকে আলীবর্দী খানকে বিহারের সহকারী সুবাদার পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তবে এই পদ প্রাপ্তির পর থেকেই উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠেতে দেখা যায় তাকে। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার অযোগ্য ছেলে সরফরাজ খান বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। অযোগ্যতা, অক্ষমতার পাশাপাশি নানা কারণে তাঁর সাথে আলীবর্দীর সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। বিশেষ করে নবাবের দুর্বল চরিত্র ও তাঁর গৃহীত নানা সিদ্ধান্ত এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। অবশেষে ১৭৪০ সালে গিরিয়ার রণক্ষেত্রে নবাব সরফরাজ খান পরাজিত ও নিহত হন। তার পরাজয়ের পরে বাংলার মসনদে বসেন আলীবর্দী খান। পাশাপাশি মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহের থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদ লাভ করেছিলেন তিনি। অনেক অর্থবিত্ত খরচ করে তিনি এই অঞ্চল স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন।

আলীবর্দী খান প্রায় ষাট বছর বয়সে ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কর্মক্ষমতা ও নৈপুণ্য নিয়ে তিনি শাসনে মনোনিবেশ করেন। তিনি তাঁর ভাতিজা ও জামাতা নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানকে বাংলার সুবার দিওয়ান ও জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিম নিযুক্ত করেছিলেন। হোসেন কুলি খান নওয়াজিসের নায়েব ছিলেন। নবাব তাঁর জামাতা জৈনুদ্দিন খানকে বিহারের নায়েব নিযুক্ত করেন। জয়েন উদ্দিন খান ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার পিতা। তার বৈমাত্রেয় বোন শাহ খানমের স্বামী মুহাম্মদ জাফর খান পুরাতন সৈন্যদলের বখশী ছিলেন। এর বাইরে নুরুল্লাহ বেগ খানকে নতুন সৈন্যদলের বখশী পদে নিয়োগ করা হয়। তার প্রশাসনে আলীবর্দী চিনরায়কে খালসা বিভাগের দিওয়ান এবং জানকী রামকে নিজের পরিবারের দিওয়ান নিযুক্ত করতে দেখা যায়। গোলাম হোসেন খানকে হাজিব পদ দেয়া হয়। নবাব আলীবর্দী তাঁর জামাতা সৈয়দ আহমদ খানকে রংপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। পাশাপাশি আতাউল্লাহ খানকে রাজমহল ও ভাগলপুরের ফৌজদারের দায়িত্ব দেয়া হয়। অন্যদিকে সৈন্যবাহিনী, নৌবহর, কামান-বারুদ, খাজাঞ্চিখানা থেকে শুরু করে অস্ত্রাগারের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব বর্তায় নানা যোগ্য ব্যক্তির উপর। নবাব সুজাউদ্দিনের জামাতা রুস্তম জঙ্গ ছিলেন উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্তা। তিনি আলীবর্দী খানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলা আক্রমণ করতে উদ্যত হলে সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে বালেশ্বরের নিকট ফুলয়ারী নামক স্থানে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষে রুস্তম পরাস্ত হয়ে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান। আলীবর্দী বিদ্রোহ দমন করে উড়িষ্যায় তার আধিপত্য নিশ্চিত করেন। এদের তৎপরতা তাঁর প্রতিপত্তি বিস্তারের পথে অন্তরায় হয়েছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলায় মারাঠা আক্রমণের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।**

সারসংক্ষেপঃ

আলীবর্দী খান শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির নবাব ছিলেন। তিনি জ্ঞানী গুনীদের কদর করতেন। তাঁর সময় বাংলায় ফার্সি সাহিত্য ও পারসিক রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। তিনি মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেও শেষ পর্যন্ত

ইউরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তারের অনুমতি দিয়ে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন বাংলার জন্য। তিনি দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নেও কার্যকর ভূমিকা রাখেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই তাঁর ৮০ বছর বিস্তৃত জীবনের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আলীবর্দী খানের অধীনে উড়িষ্যার নায়েবে নাজিম ছিলেন-
ক) মুর্শিদকুলি খান খ) সুজাউদ্দিন খান গ) সরফরাজ খান ঘ) মীর হাবিব

২. আলীবর্দী খান সরফরাজ খানকে পরাজিত করেন-
ক) বকসারের যুদ্ধে খ) মহিশূরের যুদ্ধে গ) গিরিয়ার যুদ্ধে ঘ) পলাশির যুদ্ধে

৩. আলীবর্দী খান সিংহাসনে আরোহণ করেন-
ক) ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে খ) ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে গ) ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে ঘ) ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে

৪. বাংলায় মারাঠা অভিযানের সেনাপতি ছিলেন-
ক) শিবাজী খ) রঘজী ভোঁসলে গ) ভাস্কর পণ্ডিত ঘ) বালাজী রাও

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

বিকেলে কলেজ থেকে বাসায় ফিরে টিভি সেটের সামনে বসেছে আলী। উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট জনৈক ব্যক্তিকে চরম শাস্তি দিয়েছেন। তাকে কামানের মুখে বসিয়ে গুলি করে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এই সংবাদে পুরো বিশ্ব হতবাক। পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে নানাবিধ হুমকির কথাও শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ মত প্রকাশ করছেন এই সিদ্ধান্তও হঠকারী শাস্তি বিধান দেশটির জন্য সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। আলী ভাবতে থাকে এভাবেই সরফরাজ খানের কিছু ভুল সিদ্ধান্ত ও হঠকারিতা শেষ পর্যন্ত আলীবর্দী খানকে বাংলার সিংহাসনে আসীন করেছিল।

উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিন–

১. আলীবর্দী খান কে ছিলেন? ১
২. আলবর্দী খানের প্রাথমিক জীবন কেমন ছিল? ২
৩. পরিচয়সহ তাঁর কর্মময় জীবনের বিবরণ দিন। ৩
৪. আলীবর্দীর রাজত্ব কালে বাংলায় মারাঠা আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। ৪

পাঠ-৭.৫ নবাব সিরাজউদ্দৌলা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাণিজ্য সুবিধার অপব্যবহার করেছিল তার বিচার করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**জৈনুদ্দিন খান, ময়মুনা ও আমিনা**

ভূমিকা: নবাব আলীবর্দী খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর তিন মেয়ে ছিল। তাদের নাম যথাক্রমে আমিনা, ময়মুনা ও ঘষেটি বেগম ময়মুনা ও আমিনার দুই ছেলে ছিল। তবে ঘষেটি বেগমের কোনও সন্তান ছিল না। আলীবর্দী খান আমিনার ছেলে সিরাজউদ্দৌলাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এ কারণে নবাব তাঁকেই তাঁর জীবিত কালে বাংলার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন। সিরাজের জন্ম ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম ছিল জৈনুদ্দিন খান। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু হলে মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিরাজউদ্দৌলা বাংলা ও বিহারের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে বসার পর থেকেই ঘরে-বাইরে নানা ধরণের ষড়যন্ত্র ও বাধা বিপত্তির মুখে পড়েছিলেন। তাঁর নবাবির দায়িত্ব গ্রহণকে আলীবর্দী খানের অন্য দুই মেয়ে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। তারা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার শুরু করে। এতে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় পূর্ণিয়ার শাসক শওকত জঙ্গ এবং ঘষেটি বেগমের দিওয়ান রাজা রাজবল্লব। সুযোগ বুঝে ইংরেজরা এই ষড়যন্ত্রে পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করে। সিরাজউদ্দৌলা পারিবারিক ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে এ ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল রাজ দরবারের প্রভাবশালী দেশীয় রাজন্যবর্গ। তাদের অপকর্মে ইন্ধন যোগায় সুবিধাভোগী ইংরেজ বেনিয়ারা। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্পদায়ের প্রভাবশালী অনেক ব্যক্তি জড়িত ছিলেন। তারা সিরাজের বিরুদ্ধে দিনরাত নানামুখী ষড়যন্ত্রের ডানা মেলতে থাকে। তাদের সব ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবে এক নির্মম পরিণতি হয়ে এসেছিল পলাশীর যুদ্ধ। ১৭৫৭ সালে ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত এ যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। তাঁর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় স্বাধীন শাসনের সমাপ্তি ঘটে। অন্যদিকে বাংলায় প্রতিষ্ঠা পেতে দেখা যায় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

সিংহাসনে আরোহনের পর নানা দিক থেকে চাপে ছিলেন নবাব সিরাজ। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে তার অনেক সময় লেগে যায়। বলতে গেলে ঘরে বাইরে সবদিক থেকে বিদ্রোহের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। এই সুযোগ কাজে লাগায় সুবিধাভোগী ইংরেজগণ। তারা সিরাজউদ্দৌলাকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বীকৃতি প্রদান করেনি। এমনকি ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে আসেনি। আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে তারা কোনো ধরণের উপঢৌকনও প্রেরণ করেনি। ইংরেজদের এরূপ অবাধ্যতার জন্য নবাব স্বভাবতই তদের প্রতি বিরাগভাজন হন। ইংরেজরা বহুদিন থেকে বাংলার শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। শওকত জঙ্গ, ঘষেটি বেগম তাদের সামনে সে সুযোগ নিয়ে আসে। পাশাপাশি দিওয়ান রাজবল্লভ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় তাদের কাজ আরও সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে ইংরেজরা তাদের স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতিটি ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল। ফলে সিরাজ এই বিদেশী

শত্রুদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন শুরু থেকে। তারা শেষ পর্যন্ত সরাসরি বিদ্রোহে যুক্ত হয়ে ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। নবাব আলীবর্দী খানের সময়ে ইংরেজরা বাণিজ্য করার অনুমতি পেয়েছিল। প্রথমবারের মত তাদের এই অনুমতি প্রাপ্তি মূলত সব সর্বনাশের সূচনা করে। তবে তারা তখন দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি পায়নি। এদিকে সিরাজের রাজত্বকালে তারা নানা বিশৃঙ্খলা থেকে সুযোগ গ্রহণ করে। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ করে। তাদের দেখাদেখি ফরাসিরাও চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ শুরু করে। নবাব সিরাজ তাদের দুর্গ নির্মান বন্ধ করতে আদেশ দেন। ফরাসিরা তার এ আদেশ মেনে নিয়েছিল। তবে সুযোগ সন্ধানী ও উচ্চাভিলাষী ইংরেজরা তার নির্দেশ অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে নবাব তাদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে সরাসরি যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অন্যদিকে হলওয়েলের কল্পকাহিনীতে 'অন্ধকূপ হত্যা' বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল যা এক অর্থে নবাবের সম্মান হানি করে।

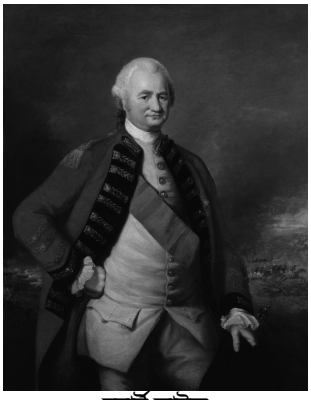
রবার্ট ক্লাইভ

সিরাজের বিরুদ্ধে খালা ঘষেটি বেগম এবং পূর্ণিয়ার শাসক শওকত জঙ্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদের সমর্থন জানায়। এর ফলে ইংরেজদের উপর ক্ষোভ প্রকাশ্য শত্রুতায় রূপ নেয়। এদিকে রাজবল্লভের পুত্র দ্ধৃষ্ণদাস প্রচুর ধনরত্নসহ পালিয়ে যায় কলকাতায়। সে সেখানে গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয়লাভ করে। সম্পদসহ কৃষ্ণদাসকে ফেরৎ দিতে পুরো অস্বীকার করে ইংরেজরা। শুধু অস্বীকার করেই তারা চুপ থাকেনি। উপরন্তু নবাবের প্রেরিত দূতকে পর্যন্ত ইংরেজরা অপমানিত করে তাড়িয়ে দেয়। নবাব আলীবর্দী এক অর্থে বাংলার সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন ইংরেজদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে। তারা নানা ধরণের ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যোগানোর পাশাপাশি প্রদত্ত সকল বাণিজ্যিক সুবিধার অপব্যবহার অব্যাহত রেখেছিল। কোম্পানির কর্মচারিরা ব্যক্তিগতভাবে বেআইনী ব্যবসায় যুক্ত ছিল। তারা এভাবে অনেক শুল্ক ফাঁকি দিত। নবাব এর প্রতিকার দাবি করেন। তার জবাবে ঔদ্ধত্যের সব সীমা অতিক্রম করে ইংরেজ গভর্নর ড্রেক তা উপেক্ষা করে বসেন। সবথেকে বড় সমস্যা হয়ে দেখা যায় নবাব আলীবর্দী খানের সাথে সন্ধির যাবতীয় শর্ত ভঙ্গ করার বিষয়টি। এই সন্ধি অগ্রাহ্য করে ইংরেরজরা জনসাধারণের উপর অত্যাচার শুরু করে। পাশাপাশি তারা নবাবকে কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান অবনতি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে মোড় নেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**নবাব সিরাজ উদ্দৌলার উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।**

সারসংক্ষেপ:

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে আগত ইংরেজরা বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় আরোহণ করে। স্থানীয়দের সহায়তা নিয়ে তারা অনেক আগে থেকেই ক্ষমতায় আরোহনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল। পরের দিকে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় তাদের ক্ষমতা গ্রহণের একটি সাধারণ উপলক্ষ্য হয়ে দেখা দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কত খ্রিস্টাব্দে মসনদে বসেন?

ক) ১৭৫৫ খ) ১৭৫৬ গ) ১৭৫৭ ঘ) ১৭৫৮

২। "অন্ধকুপ হত্যা" নামক কল্প কাহিনীর জনক কে?

ক) হলওয়েল খ) ড্রেক গ) রবার্ট ক্লাইভ ঘ) ওয়াটসন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণের পর সেখানকার শাসক কাঠামোতে পরিবর্তন আসে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী বন্দী করে ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে। ঈদের দিন বিকালে প্রকাশ্যে তাঁর ফাসি কার্যকর করা হয়। টেলিভিশন সংবাদ দেখে অনেক মন খারাপ হয় আকিবের। তার বাবা বললেন বাংলার ইতিহাসও এমনি নৃশংস নানা ঘটনার স্বাক্ষী। এভাবেই বিশ্বাস ঘাতকের দল হত্যা করেছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে।

উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিন–

১. নবাব সিরাজউদ্দৌলা কে ছিলেন ? **১**

২. নবাবের বিরুদ্ধে কিভাবে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল? **২**

৩. কিভাবে বাণিজ্য সুবিধার অপব্যবহার করেছিল? **৩**

৪. পলাশী যুদ্ধের পটভূমি লিখুন? **৪**

পাঠ-৭.৬ পলাশীর যুদ্ধঃ ঘটনা, কারণ ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পলাশী যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণ ও ফলাফল জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**পলাশী যুদ্ধ, অন্ধকূপ হত্যা, আলী নগরের সন্ধি ও মুহাম্মদী বেগ**

ভূমিকাঃ ক্ষমতা গ্রহণ করেই ইংরেজদের নানা ধরণের অবাধ্যতা প্রত্যক্ষ করেন নবাব সিরাজুদ্দৌলা। তিনি তাদরে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে সমুচিত শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। এজন্য কলকাতার দিকে অগ্রসর হন তিনি। পথিমধ্যে নবাব কাশিম বাজারের ইংরেজ কুঠি দখল করেন। নবাবের এ অতর্কিত আক্রমণে ভীত হয়ে গভর্নর ড্রেক ও তাঁর সাথীরা ফোর্ট উইলিয়াম ছেড়ে 'ফলতা' নামক স্থানে আশ্রয় নেয়। নবাব কলকাতা দখল করেন এবং আলীবর্দী খানের নামানুসারে এর নাম রাখেন 'আলীনগর'। হলওয়েল ও তার সাথীরা পরাজিত হয় নবাবের বাহিনীর কাছে। তারা অনেকেই আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। আত্মসমর্পণের পর তাদের উপর কোন রকম অত্যাচার করা হয়নি। 'অন্ধকূপ হত্যা' নামক বীভৎস কাল্পনিক কাহিনীর জন্ম দেয় ইংরেজরা। কথিত আছে নবাবের আদেশে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে ছোট একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল। জুন মাসের প্রচন্ড গরমে এদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যায় বাকী ২৩ জন কোন রকমে বেঁচে যায়।

কলকাতা অধিকার করে মানিকচাঁদকে এর দায়িত্বে রেখে নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরে যান। ইতোমধ্যে ইংরেজরা মাদ্রাজ থেকে অধিক সৈন্য সংগ্রহ করে। ওয়াটসন ও রবাট ক্লাইভের নেতৃত্বে মানিক চাঁদের নামমাত্র প্রতিরোধ ভেঙ্গে কলকাতা পুনরায় দখল করে নেয়। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের শত্রুতা ধীরে ধীরে চূড়ান্ত রূপ নিতে থাকে। নবাব বেশ ভালবাবে বুঝতে পেরেছিলেন কোনোরকম ছাড় দিতে থাকলে ইংরেজরা কতটা হিংস্র, ধ্বংসাত্মক এবং আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। ইংরেজরা আবার কলকাতা অধিকার করেছে এমন সংবাদ পেয়ে নবাব আবারও কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর সেনাপতির বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ জাগে। আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণের সম্ভাবনাও তাঁর জন্য অস্বস্তির কারণ ছিল। এবার নবাব ইংরেজদের সাথে আরও একটি সন্ধি করেন। ইতিহাসে এটি 'আলীনগরের সন্ধি' নামে খ্যাত। ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি এ সন্ধি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। অন্যদিকে এ সন্ধির শর্তানুসারে নবাব দিল্লির সম্রাট কর্তৃক ইংরেজদের প্রদত্ত সকল বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি প্রদান, টাকশাল নির্মাণ এবং দুর্গ সংস্কার করার অনুমতি প্রদান করেন। 'আলীনগরের সন্ধি' ইংরেজ নেতা রবার্ট ক্লাইভকে খুশী করতে পারেনি। তিনি ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে একটি স্বার্থান্বেষী চক্রের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন তিনি। বিশেষ করে নানা ধরণের দুর্নীতি, অপকর্ম আর ব্যক্তি স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত নানা দেশীয় মানুষ তার এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। ইতোমধ্যে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে তার প্রতিক্রিয়া ভারতীয় উপমহাদেশেও দেখা দেয়। নবাবের নিদের্শ অমান্য করে ইংরেজরা ফরাসিদের কুঠি চন্দননগর অধিকার করে নেয়। নবাব তাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হন। পাশাপাশি পলাতক ফরাসিরা নবাবের দরবারে আশ্রয় নেয়। এরপর তারা ফ্রাঙ্কো-বাংলা আক্রমণের আশঙ্কা করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তৎপর হয়ে উঠতে দেখা যায় ইংরেজদের। পাশাপাশি দরবারের ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যোগ দিতে দেখা গেছে তাদের। নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলেন ধনকুবের জগৎশেঠ, নবারের সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভ, আন্তাভাজন উঁমিচাদ, দিওয়ান রাজবল্লভ প্রমুখ। তাঁরা মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। এর বিনিময়ে মীরজাফর ইংরেজদেরকে পৌনে দুই কোটি টাকা দেওয়ার জন্য অঙ্গীকার করেছিলেন। উঁমিচাঁদ এ গোপন চুক্তি ফাঁসের ভয় দেখায়। তখন ক্লাইভ তাকে প্রচুর

অর্থ প্রদানের অঙ্গীকারসহ একটি জালচুক্তি পত্র তৈরি করেন। তবে এই জাল চুক্তিপত্রের ভুলগুলো সেভাবে ধরতে পারেননি উমিচাঁদ। ফলে তিনি প্রতারিত হন।

পলাশীর যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, স্বার্থপরতা ও দেশদ্রোহিতার নিকৃষ্ট এক উদাহরণ সৃষ্টির উপলক্ষ হয়ে এসেছিল পলাশী যুদ্ধ। বাংলার ইতিহাসে এখনও নেতিবাচক কোনো অধ্যায় বলতে এই পলাশী যুদ্ধকেই বোঝানো হয়ে থাকে। ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে সন্ধি ভঙ্গের মিথ্যা অজুহাতে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নবাব আগে থেকেই ইংরেজদের দুরভিসন্ধি এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এ কারণে তিনি ৫০টি কামানসহ ৫০ হাজার পদাতিক ও ১৮ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। নবাব তার বাহিনী মুর্শিদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর তীরে মোতায়েনের আদেশ দেন। অন্যদিকে ক্লাইভ ৮টি কামানসহ ১০০০ জন ইউরোপীয় ও ২০০০ জন দেশীয় সৈন্যসহ পলাশীর আমবাগানে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আমবাগানে বাংলার ইতিহাস নতুন করে লিখতে হয়েছিল। বিশেষত এই লড়াই যতটা না যুদ্ধ ছিল তার থেকে অনেকাংশেই নবাবের ভাগ্য পরীক্ষা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। মীর মদন ও মোহন লাল নবাবের পক্ষে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সেনাদল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন। মীরমদন যুদ্ধ ক্ষেত্রে গোলার আঘাতে শহীদ হন। এদিকে মোহনলালের বীর বিক্রমে লড়াই ধীরে ধীরে ইংরেজদের বিপক্ষে চলে যায়। এ সময় মীরজাফরের কুপরামর্শে যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া হয়।

যুদ্ধ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে নতুনভাবে সংঘটিত হয়ে ইংরেজরা পাল্টা আক্রমণ চালায়। এতে নবাবের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। নবাব কোন রকম প্রাণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। প্রাথমিকভাবে যুদ্ধে নবাবের ৫০০ জন সৈন্য নিহত হয়েছিলেন। তবে মোহনলাল প্রথম দিকে যুদ্ধে যেভাবে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাতে ইংরেজদের ২৩ জন্য সৈন্য শুরুতেই নিহত হয়েছিল। তবে যুদ্ধে বন্ধের আদেশ প্রাপ্তির পর তিনি আর লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি। অন্যদিকে ফরাসি নেতা সিনফ্রেও যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের পক্ষে প্রবল বিক্রমের সঙ্গে লড়াই করেন। সিরাজ মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে একটি নতুন সেনাবাহিনী গঠনে ব্যর্থ হন। পরে পরিস্থিতি পুরো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে পাটনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি রাজধানী থেকে পলায়ন কালে পথিমধ্যে রাজমহলের কাছে ধরা পড়েন। বিশ্বাসঘাতক নতুন নবাব মীরজাফরের পুত্র মীরন তাকে হত্যার আদেশ দেয়। এ আদেশ বাস্তবায়ন করে মুহাম্মদী বেগ। ১৭৫৭ সালে ২ জুলাই ছুরিকাঘাতে নবাবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলার প্রায় দু'শ বছরের স্বাধীনতা অস্তমিত হল।

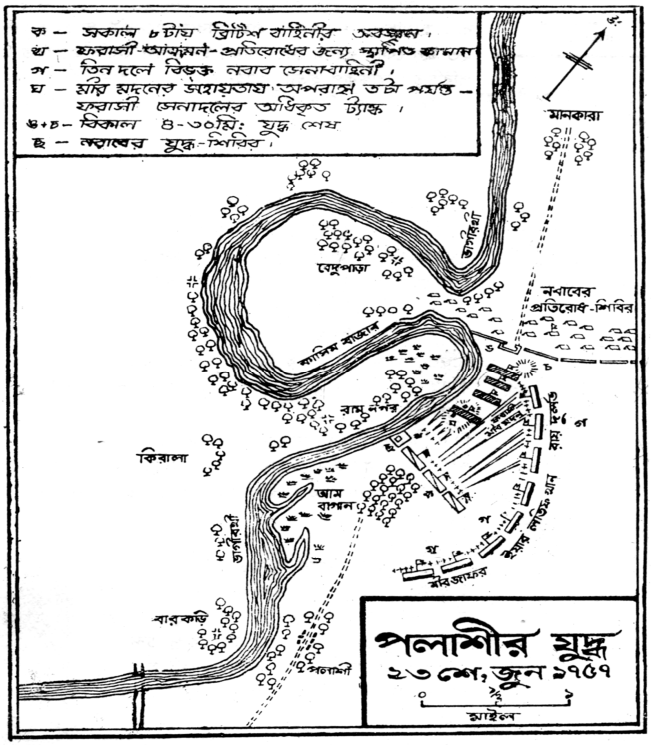

পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্র

নবাবের পতনের কারণ

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি নানা কারণে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়েছিল অনেক আগে। আত্মীয় স্বজনের পাশাপাশি দরবারের আস্থাভাজন অনেকে আস্থাহীন আচরণ করায় ইংরেজদের কাছে পরাজয় তার পতনের একটি উপলক্ষ্য মাত্র। পলাশীর এই খণ্ডযুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নবাব পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন। এ পরাজয়ের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল–

বিশ্বাসঘাতকতাঃ মীরজাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল নবাবের পতনের মূল কারণ। বিজয়ের পূর্বক্ষণে প্রধান সেনাপতি হিসেবে তিনি নবাবকে ভুল পরামর্শ দেন ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভুমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মীরজাফর বিশ্বাস ঘাতকতা করে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ না দিলে মোহনলাল যেভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন ইংরেজ বাহিনীর পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল। প্রথম দিকের নানা বিশ্বাসঘাতকতা শেষ পর্যন্ত তেমন কাজে আসেনি। অন্তত শেষ পর্যায়ে সেনাপতি হিসেবে মীর জাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করলে এ যুদ্ধে নবাবেরই বিজয়ী হওয়ার কথা।

অদূরদর্শিতা ঃ তরুণ নবাবের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাব এবং মাতামহের অত্যাধিক স্নেহ প্রাচুর্যে বেড়ে উঠা সিরাজের চরিত্রে কঠোরতা ও দৃঢ়তার অভাব ছিল। জটিল পরিস্থিতিতে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেও সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে সাহসী হন নি। এই সিদ্ধান্তগত দুর্বলতার জন্যই তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

অবিশ্বাস ও অনাস্থাঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত বিজয়কে উপেক্ষা করে নবাবের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা তাঁর সমরনীতির অপরিপক্কতার ও পরনির্ভরশীলতার পরিচয় বহন করে যা তাঁর পতনকে ত্বরান্বিত করে। তিনি নিজের সেনাবাহিনীর উপর সেভাবে আস্থা রাখতে পারেননি। ফলে মীর জাফরের মত বিশ্বাস ঘাতকের পরামর্শ তাকে প্রভাবিত করতে পারে। এই অবিশ্বাস ও অনাস্থা শেষ পর্যন্ত তার পরাজয়ের কারণ হয়ে দেখা দেয়।

দৃঢ়তার অভাবঃ নবাবের চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব থাকায় সুযোগ নিয়েছিল ইংরেজরা। ফরাসিরা তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল আগেই। তিনি তাদের এই পরামর্শ কানে তোলেন নি। নবাব আলীবদী খানও মৃত্যুর আগে সিরাজকে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে সতর্ক করে গেলেও তিনি ইংরেজদের দমনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ রণকৌশলঃ নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মূল হোতা রবার্ট ক্লাইভ ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি সামরিক দিক থেকেও এগিয়ে ছিল। সে দক্ষ কূটনীতি, উন্নত রণকৌশল এবং রণসম্ভারে নবাবের বিশাল বাহিনীর থেকে এগিয়ে ছিল। তার বাহিনীর পারদর্শীতার কাছেও নবাব অনেকাংশে কুপোকাত হয়েছিলেন। ফলে ক্লাইভের নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটার পরোক্ষ কারণ হিসেবে ক্লাইভের দক্ষতাকেও উল্লেখ করা যায়।

ফলাফলঃ আপাত দৃষ্টিতে পলাশীর যুদ্ধ একটি খণ্ড যুদ্ধের চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। তবে এর ফলাফল ছিল দীর্ঘমেয়াদী ও সুদূরপ্রসারী। এ যুদ্ধের রাজনৈতিক -অর্থনৈতিক- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং এর প্রভাবেই বাংলার রাজনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন এসেছিল। বিশ্বাসঘাতকতার উপহার হিসেবে প্রথম দিকে মীর জাফর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তার ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেননি। নিচে পলাশী যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করা হলো–

নবাবের পতনঃ পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে। এরপর পথিমধ্যে ধরা পড়ে ঘাতকের হাতে তাঁর অকাল মৃত্যু হলে বাংলার স্বাধীনতার দীর্ঘদিনের জন্য অস্তমিত হয়।

ক্ষমতা বদলঃ পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফর বাংলার সিংহাসন লাভ করলেন। কিন্তু প্রকৃত রাজক্ষমতা ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তিনি সকল কাজই করতেন ইংরেজদের পরামর্শে। ফলে এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা মতান্তরে চলে গিয়েছিল ইংরেজদের হাতেই।

বাংলার দেউলিয়াত্বঃ পলাশীর যুদ্ধের পর উপমহাদেশে ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হলেও তারা নতুন নবাবের কাছে থেকে নগদ এক কোটি টাকা এবং চব্বিশ পরগণার বিশাল জমিদারী লাভ করেন। ফলে বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের যখন তখন হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত হয়। এর মধ্য গিয়ে বাংলা পুরোপুরি দেউলিয়া হতে বসে।

একচেটিয়া ইংরেজ বাণিজ্যঃ এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করেন আর এদেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়। পাশাপাশি তারা ইউরোপের অন্য দেশের বণিকদেরও বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

ফরাসিদের দুর্ভোগঃ এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইংরেজরা বাংলাসহ দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তার করে ফরাসি বণিকদের বিতাড়িত করে এবং একচেটিয়াভাবে উপমহাদেশের সম্পদ আহরণ ও ইংল্যান্ডে প্রেরণের ফলে এদেশের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে

যায়। তবে তারা সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছিল ফরাসিদের। বলতে গেলে এই যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের বাণিজ্য ও রাজনীতিতে ফরাসিদের সব সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল।

ভারত দখলঃ এ যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ উপমহাদেশে ইংরেজদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। পরবর্তীতে সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধে তারা মীর কাসিমকে পরাজিত করে। পাশাপাশি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে পরাজিত করে পুরো ভারত উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতনের কারণ কি ছিল তা জানতে পারবেন।**

সারসংক্ষেপঃ

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে আগত ইংরেজরা বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় আরোহণ করে। স্থানীয়দের সহায়তা নিয়ে তারা অনেক আগে থেকেই ক্ষমতায় আরোহনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল। পরের দিকে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় তাদের ক্ষমতা গ্রহণের একটি সাধারণ উপলক্ষ্য হয়ে দেখা দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পক্ষে প্রাণপণ দেশ প্রেমিকের মত যুদ্ধ করেন-
ক) রায়দুর্লভ খ) ইয়ার লতিফ গ) মোহন লাল ঘ) মীরজাফর

২. পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে সেনাপতি ছিলেন-
ক) ওয়াটসন খ) ক্লাইভ গ) সিনফ্রে ঘ) কর্ণওয়ালিস

৩. ইংরেজগণ আলীনগরের সন্ধিকে-
ক) মেনে চলে খ) নবায়ন করে গ) অমান্য করে ঘ) ভঙ্গ করে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ছোট চাচার কাছে মায়ানমারের নেত্রী অং সান সুচির নাম শুনেছে ইকবাল। তার মনে পড়ছে সুকি শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার পর্যন্ত পেয়েছেন। গত কয়েকদিন ধরে মিয়ানমারে যা ঘটছে তার সঙ্গে সে কিছুতেই এই শান্তিতে নোবেল প্রাপ্তির বিষয়টিকে মেলাতে পারছে না। বিশেষ করে নারীদের উপর জঘন্য নির্যাতন, মানুষের ঘড় বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া। শিশু, নারী, বৃদ্ধ কিংবা সবল পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে কুপিয়ে হত্যা করার মত জঘন্যতা সেখানে ঘটছে। টিভি খুলে এর আগে সে ইরাকের নানা স্থানে যুদ্ধের সংবাদ দেখেছে। কিন্তু মিয়ানমারের এমন নৃসংশ গণহত্যা সে এর আগে কখনও দেখেনি। যুদ্ধের কথা ভাবতেই তার মনে পড়ে পাঠ্য বইয়ের উল্লেখিত পলাশী যুদ্ধের কথা। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন–

১. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন? ১
২. আলীনগরের সন্ধির বিবরণ দিন। ২
৩. উদ্দীপকের আলোকে আপনার পাঠ্য বইয়ে বর্ণিত পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা দিন। ৩
৪. নবাবের পতনের কারণগুলো কি কি ছিল-সংক্ষেপে লিখুন? ৪

পাঠ-৭.৭ নবাবি শাসনের পতন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মীরজাফর ও মীর কাসিমের নবাবি লাভ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বক্সারের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ও
- বক্সারের যুদ্ধ পরবর্তী প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

	মূখ্য শব্দ	**মীর জাফর, মীর কাসিম, সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও সুজাউদ্দৌলা**

ভূমিকা: বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে নবাবি শাসনের পতন ঘটার পর থেকে ব্রিটিশদের আনুগত্যে থেকে নবাবি লাভ করেছিলেন মীর জাফর। তিনি এর আগে থেকে নবাব সিরাজের প্রতি মিথ্যা আনুগত্য দেখাতেন। পলাশীর যুদ্ধে তিনি নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের পক্ষ নিয়েছিলেন। কোম্পানির অতিরিক্ত অর্থচাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে তারা মীর কাশিমকে অল্প কিছুদিনের জন্য নবাব করেছিল। তবে তিনি ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা নবাব। তিনি বাংলায় ইংরেজদের হস্তক্ষেপকে অযৌক্তিক মনে করে তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি অযোধ্যার নবাব, এবং মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি ইংরেজদের প্রতিরোধে শাহ আলমের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি করেছিলেন। তারপর ২২ শে অক্টোবর ১৭৬৪ সালে তার নেতৃত্বে ইংরেজদের বিপক্ষে বক্সারের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। তবে নবাব মীর কাসিমের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। তারপর মীর জাফরকে তারা নতুনভাবে নবাব ঘোষনা করেছিল।

মীর জাফর

মূলত ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন মীর জাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন নবাব সিরাজ-উ-দৌলা। এরপর তাকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হলে ইংরেজ সেনাপ্রধান কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ প্রকাশ্য দরবারে মীর জাফরকে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সিংহাসনে বসান। তখন তার উপাধি হয়েছিল 'সুজা-উল-মূলক-হিশাম-উদ-দৌলা মীর মোহাম্মদ জাফর আলি খান মহাব্বত জং।' অর্থাৎ সাহসী, সাম্রাজ্যের তলোয়ার, মীর মোহাম্মদ জাফর আলি খান। এর আগে মীর জাফর ক্লাইভের সাথে একটি গোপন চুক্তি করেছিলেন। ঐ চুক্তির শর্তানুসারে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার অধিকারে থাকা রাজভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত সম্পদের দখল ও ভাগাভাগির কাজ শুরু করেছিলেন। রাজভাণ্ডারে তখন ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা রৌপ্যমুদ্রায়, ৩২ লাখ টাকা স্বর্ণমুদ্রায়, দুই সিন্দুক ভর্তি সোনার পাতা, চার সিন্দুক ভর্তি হীরা-জহরত ও অপেক্ষাকৃত ছোট দুই সিন্দুক ভর্তি মণিমুক্তা পাওয়া গিয়েছিল। এর পাশাপাশি নবাবের হারেমে একটি গোপন ভাণ্ডারে আরও ৮ কোটি টাকা ছিলো।

ক্লাইভকে বঞ্চিত করে সুকৌশলে এই ৮ কোটি টাকার পুরোটাই মীর জাফর, আমির বেগ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে নবাবের ভাণ্ডারে অর্থ না পাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয় ইংরেজরা। পাশাপাশি গোপন চুক্তির শর্তানুসারে ক্লাইভকে দেড় কোটি টাকা দিতে ব্যর্থ হন মীর জাফর। ফলে বাধ্য হয়েই মীর জাফরকে বর্ধমান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ইংরেজদের কাছে ইজারা দিতে হয়েছিল। সিংহাসনে বসার পর ক্লাইভ প্রচলিত রীতি অনুসারে নবাবকে আনুষ্ঠানিক নজরানা প্রদানের পাশাপাশি তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। তবে মীর জাফরের প্রতি বিরাগভাজন হতে তাদের বেশি সময় লাগেনি। শেষে তারা মীর কাসিমকে বাংলার সিংহাসনে বসায়।

মীর কাসিম ও বক্সারের যুদ্ধ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬০ সালের ২০ অক্টোবর মীর জাফরকে সরিয়ে দিয়ে তার জামাতা মীর কাসিমকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। তার মাত্র চার বছরের রাজত্বকাল ১৭৬০ থেকে শুরু হয়ে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়েছিল।

মীর কাসিম নবাব হয়ে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। তিনি ক্ষমতায় বসার পর থেকেই কলকাতা কাউন্সিলের বেশিরভাগ সদস্য তার প্রতি সন্দেহ ও শত্রুতা পোষণ করতে থাকেন। তবে দক্ষ কূটনীতির মাধ্যমে মীর কাসিম দ্বিতীয় শাহ আলমের স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। পাশাপাশি রাজকোষের আয় বাড়ানোর জন্য রাজ্যের কতকগুলো বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচন করেছিলেন। পাশাপাশি ধনী নগরবাসীর অতিরিক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি জমিদারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে সৈন্যদল শক্তিশালীকরণে মন দিয়েছিলেন তিনি।

ক্ষমতায় বসেই শাসনকার্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন মীর কাসিম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অন্যায় অধিকার থেকে ইংরেজ কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ফায়দা নিতে থাকে। এর ফলে নবাবের অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। তিনি ইংরেজ গভর্নরের কাছে এর প্রতিকার দাবি করেছিলেন। তবে তারা এর উপযুক্ত সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হওয়ায় মীর কাসিম পরবর্তী সময়ে দেশীয় বণিকদের ওপর থেকেও বাণিজ্য শুল্ক প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এতে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের অযৌক্তিক সুবিধা পাওয়ার পথ বন্ধ হলে তারা তা মেনে নিতে পারেনি। নবাব মীর কাসিমের সাথে ইংরেজদের বিরোধ চরমে উঠলে তা পাটনায় সংঘর্ষের রূপ নেয়। এরপর ১৭৬৩ সালের ৭ জুলাই নবাব বাহিনীর সাথে ইংরেজদের ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। পরপর কাটোয়া, ঘেরিয়া, মুর্শিদাবাদ, সুটি, উদয়নালা ও মুঙ্গেরে নবাব বাহিনীর সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল। নবাব তখন পরাজিত হয়ে পাটনায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাহায্য নিয়ে তিনি বাংলাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর বিহারের বক্সার নামক স্থানে দু'পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। তাদের সম্মিলিত বাহিনী বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়। নিদারুণ দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র ভোগ করে ১৭৭৭ সালের ৬ জুন জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে শাজাহানাবাদের এক অখ্যাত পল্লীতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন মীর কাসিম।

কোম্পানির দেওয়ানি লাভ

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীরকাশিম পরাজিত হওয়ার পর ইংরেজদের গতিরোধ করার মতো শক্তি ও সাহস এদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তখন থেকেই বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজরা সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করে এবং বাংলার ভাগ্যবিধাতা হয়ে যায়। সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফরের আমলে কেন্দ্রিয় সরকারকে রাজস্ব দেয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানি হয়ে উঠেছিল পুরো দেশের আসল শাসনকর্তা। কেন্দ্রিয় রাজনীতি তথা সমগ্র উপমহাদেশ তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল তখন। তখন কয়েকবার কোম্পানিকে বাৎসরিক কিছু উপঢৌকনের বদলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দিউয়ানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম। অন্যদিকে যুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে। পাশাপাশি বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ খারাপ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ কোম্পানির দুর্নীতি দমন ও স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য নতুনভাবে ক্লাইভকে লর্ড উপাধি দান করে বাংলায় দ্বিতীয়বার প্রেরণ করেন (১৭৬৫-১৭৬৭ খ্রি.)। বাংলায় এসে ক্লাইভ সবার আগে মীর কাশিমের মিত্র অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের প্রতি নজর দিয়েছিলেন। তিনি বক্সার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা আদায় করেন। পাশাপাশি কারা ও এলাহাবাদ জেলা দু'টি জায়গীর হিসেবে নিয়ে অযোধ্যার নবাবের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। তারপর তিনি দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন। বাস্তবে ক্লাইভ কারা ও এলাহাবাদ জেলা দু'টি থেকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে সম্রাটের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করেছিলেন। বস্তুত ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানির সনদ লাভ করেছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করবেন।**

সারসংক্ষেপ:

নবাবি শাসনের পতন ঘটার পর থেকে ব্রিটিশদের আনুগত্যে থেকে নবাবি লাভ করেছিলেন মীর জাফর। পলাশীর যুদ্ধে তিনি নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের পক্ষ নিয়েছিলেন। কোম্পানির অতিরিক্ত অর্থচাহিদা পূরন করতে

ব্যর্থ হলে তারা মীর কাশিমকে অল্প কিছুদিনের জন্য নবাব করেছিল। তবে তিনি ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা নবাব। তিনি বাংলায় ইংরেজদের হস্তক্ষেপকে অযৌক্তিক মনে করে তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। ২২ শে অক্টোবর ১৭৬৪ সালে তার নেতৃত্বে ইংরেজদের বিপক্ষে বক্সারের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। নবাব মীর কাসিমের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মীর কাসিমের মিত্র কে ছিলেন
ক) সুজাউদ্দৌলা খ) কার্টিয়ার গ) ওয়াটসন ঘ) কর্নওয়ালিস

২। কত খ্রিস্টাব্দে ক্লাইড দ্বিতীয় বার বাংলায় আসেন?
ক) ১৭৬৪ খ) ১৭৬৫ গ) ১৭৬৬ ঘ) ১৭৬৭

৩। ইংরেজদের পাশাপাশি দেশীয় ব্যবসায়ীদের শুল্ককর মওকুফ করেছিলেন কে?
ক) মীর কাসিম খ) শাহ আলম গ) ক্লাইড ঘ) সুজাউদ্দৌলা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

হাসান ও রুবেল দুই বন্ধু। হাসানের সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে রুবেলের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। রুবেল হাসানকে শায়েস্তা করতে স্থানীয় সন্ত্রাসী বিপুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিপুল সুযোগ বুঝে একদিন পেছন থেকে ছুরিকাঘাতে হাসানকে চরম আহত করে। এরপর কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তার রোষের শিকার হয় রুবেলও। মার খেয়ে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয় রুবেল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তার মনে হয় পলাশী যুদ্ধের ইতিহাস। সে ভাবতে থাকে বিশ্বাসঘাতকদের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হয়? উদ্দীপকটি পড়ে উত্তর দিন-

১. বাংলায় নবাবি শাসনের পতন কবে হয়েছিল। ১
২. বাংলায় নবাবি শাসনের পতন কিভাবে হয়েছিল? ২
৩. বক্সারের যুদ্ধের কারণগুলো লিখুন? ৩
৪. নবাবি শাসন পতনের ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন? ৪

পাঠ-৭.৮ নবাবি বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নবাবি বাংলার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- নবাবি বাংলার সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ও
- নবাবি বাংলার মানুষের সামাজিক জীবন কেমন ছিল তা জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**মিলাদ, সুরমা, পানদানী ও মহররম**

ভূমিকা: নবাবি বাংলার আর্থ-সামাজিক পটভূমি ও বিকাশধারা বিসয়ে গবেষণা অপ্রতুল। বাংলার নবাবদের দুর্বল শাসনের বিপরীতে নানা ধরণের স্বেচ্ছাচারিতা দেশবাসীকে হতাশ করেছিল। পাশাপাশি নানা ধরণের ব্যবসায়ী শ্রেণি সাধারণ মানুষের উপর অনেকটাই জেঁকে বসে। এই সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর নানা উপদ্রবে নবাবি শাসনের পতন ঘটে। পরবর্তীকালে ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে সংঘটিত হয় পলাশীর যুদ্ধ। এর আগে পর্যন্ত শিল্প, সংস্কৃতি,সাহিত্য, অর্থনীতি এবং সামাজিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির মুখ দেখেছিল নবাবি বাংলা। বিশেষ করে দিল্লির শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পর থেকে স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি। তবে এই সংস্কৃতিতে ক্ষমতার বাইরে থাকা সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল তুলনামূলক কম। বিশেষ করে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজকে এই সংস্কৃতি সেভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি।

নবাবি যুগের বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্পষ্ট হয় তখনকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন কেমন ছিল। বিশেষ করে নবাবি আমলের ঢাকার সমাজ জীবন বিশ্লেষণ করতে গেলে নানা সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। তখনকার ঢাকায় সামাজিক জীবনও গড়ে উঠেছিল নানা জাতি-ধর্মের সংমিশ্রনে। তার পরেও বেশিরভাগ সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবের আয়োজন ছিল ধর্মভিত্তিক। খুব সমারোহের সঙ্গে তখন এই সব উৎসব পালিত হতো। অনেক ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি ধর্মের মানুষ একে অপরের উৎসবে যোগ দিতো। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও রীতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও উৎসবে পালা-পার্বণ পালনে একত্রিত হতে দেখা গেছে সবাইকে। যেমন মুহররম আসলে হিন্দু-মুসলিম মিলে মিশে তা বেশ উৎসব মূখর পরিবেশে পালন করতো। অন্যদিকে কোথাও কোনো মসজিদ তৈরি হলে উৎসব হতো সেখানেও। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৭০০ সালের দিকের ঢাকায় বেগম বাজারের করতলব খানের মসজিদ নির্মাণের শুরুতে বেশ বড় আয়োজন হয়েছিল। নবাবি বাংলায় গৃহজীবনের বিশ্লেষণ করতে গেলে চোখে পড়ে প্রায় বেশিরভাগ বাড়িতেই বৈঠকখানা কিংবা মজলিশ ঘর থাকতো। সেখানে পান সুপারি থেকে শুরু করে আতর-সুরমা এবং নানা উপকরণ সাজানো থাকতে। নানা রকম মশলা ও সুগন্ধী উপাদানে মেয়েরা পান বানানোর কৌশল আয়ত্ব করেছিল। অন্যদিকে চীন থেকে আমদানী করা মাটির পাত্রে খাবার সাজিয়ে অতিথিদের সামনে পরিবেশন করা হতো। ঢাকার কারিগরদের তৈরী আতরদানি, পান রাখার পাত্র ও সুরমাদানির সুক্ষ্ম কারুকাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন অনেক বিদেশীও। ভাষা-হিসেবে বেশিরভাগ মুসলমানদের মধ্যে তখন ছিল আরবি ও ফারসির প্রচলন। সামাজিক যোগাযোগের একটি বড় সুযোগ ছিল নানা রকম মিলাদের আসরে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ঢাকা শহর জুড়ে তখন মিলাদের চর্চা ছিল। প্রায় প্রতিটি পরিবারে ছেলেমেয়েদের সুর করে দোয়া দরুদ পাঠ ও শিক্ষায় উৎসাহিত করা হতো। নবাবি বাংলায় নানা ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। বাংলার নবাবগণ শুধু রাজনীতিই নয়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন। অন্যদিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-সংগঠন-অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে আর্থিক সহায়তা ও অনুদান দিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি নানা সমাজসেবামূলক কাজেও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ করা গেছে। এ ধরণের নানা উদ্যোগের ফলে নবাবি বাংলার মানুষ আর্থিকভাবেও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছিল।

নবাবি বাংলার শাসন কাঠামোতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি সে সময়ের সমাজ সংস্কৃতিকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান তখন বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে উদযাপন করা হত। উদাহরণ হিসেবে দুই ঈদের কথা বলা যেতে পারে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় শ্রেণি, বর্ণ, গোত্র ও অবস্থাসম্পন্ন মানুষ নির্বিশেষে একত্রিত হতেন। এসময় তাঁরা পরস্পর কুশল বিনিময় করতেন। অনেক স্থানে নবাবের আনুকূল্যে

স্থানীয় শাসকরা দুস্থদের জন্য বিশেষ ভোজের আয়োজন করতেন। অনেক ক্ষেত্রে এমন সব অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষাকৃত আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা পর্যন্ত করতেন বলে জানা যায়। তবে এই সময়ের নানা আয়োজনের ক্ষেত্রে রাজধানীর আশেপাশের মানুষের প্রাধান্য ছিল। গ্রামের মানুষের জীবন ছিল সাদামাটা। বেশিরভাগ উৎসবের বর্ণিল আয়োজনে তাদের অতি সাদামাঠা জীবনকে সেভাবে স্পর্শ করতে পারেনি।

শিক্ষার্থীর কাজ	**নবাবি বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।**

সারসংক্ষেপঃ

মুর্শিদ কুলি খানের ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে বাংলার বিপন্নতার আয়োজন শেষ দিকে এগিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে সংঘটিত হয় পলাশী যুদ্ধ। বয়সে নবীন সিরাজ উদ্দৌলাকে তখন লড়তে হয়েছিল এক সংঘবদ্ধ ও সচেতন বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে। অপেক্ষাকৃত উন্নত হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে আসা ইংরেজ বাহিনী প্রথমে পরাজিত হয়। তবে বিশ্বাসঘাতকরা শেষ পর্যন্ত নবাবের জয়লাভের সে সুযোগ নষ্ট করে দেয়। এর আগে পর্যন্ত শিল্প, সংস্কৃতি,সাহিত্য, অর্থনীতি এবং সামাজিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির মুখ দেখেছিল নবাবি বাংলা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নবাবি বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব কোনটি?

ক) মিলাদ খ) জিকির গ) জলসা ঘ) ওয়াজ

২। করতলব খান মসজিদ নির্মাণের সময় কি করা হয়েছিল?

ক) জনসবাবেশ খ) বক্তৃতা গ) জসলে জুলুস ঘ) উৎসব

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মাহবুবের ছোট ভাই মাসুম নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাদের স্কুলের ইতিহাস শিক্ষক নবাবি বাংলার শাসন নিয়ে আলোচনা করছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। তাঁর আলোচনার পুরোটা জুড়ে ছিল নানা রকম যুদ্ধ আর বিশ্বাসঘাতকতার কথা। মাসুম অবাক হয়ে লক্ষ করে এতক্ষণের আলোচনায় নবাবি বাংলার সাধারণ মানুষ সম্পর্কিত কোনো কিছুই জানতে পারেনি সে। বাসায় ফেরার পর সে তার বড় ভাই মাহবুবের কাছে জানতে চায় এই সময়ে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানা বিষয় নিয়ে। উদ্দীপকটির আলোকে উত্তর দিন।

১. বাংলার নবাবের কোন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে? ১

২. নবাবি বাংলায় সাধারণের জীবন কেমন ছিল? ২

৩. উদ্দীপকের আলোকে নবাবি বাংলার উৎসবগুলো সম্পর্কে লিখুন? ৩

৪. নবাবি বাংলায় সামাজিক শ্রেণির বিকাশের চিত্র তুলে ধরুণ। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ ঃ ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ ঃ ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। খ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ ঃ ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬ ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৭ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৮ ঃ ১। ক ২। গ